AUG 28 2002

অভাজন-কথা

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা কেয়ার অফ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ফয়েজ মাহ্‌মুদ

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' নামের প্রতিষ্ঠান এবং এর করিৎকর্মা কর্মকর্তারা দেশের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে গভীর ও বিচিত্রমুখী গবেষণায় ব্যস্ত। দেশের কলেজগুলো এদের গবেষণাগার এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা যথোপযুক্ত ও যথার্থ গিনিপিগ। এ গবেষণায় হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে দেশের ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবক-সচেতন মানুষ সবাই। সেসঙ্গে এই হতাশা থেকে পরিত্রাণও চায় সকলে; কিন্তু এ দায় কার? আমাদের ধারণা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি এবং দেশের প্রতিথযশা শিক্ষা-চিন্তাবিদদের সমন্বিত প্রচেষ্টাই দেশের উচ্চ শিক্ষার এ ব্যাপক পরিসরকে সঠিক পথনির্দেশনা দিতে পারে। অন্যথায় উচ্চ শিক্ষার নামে যা হচ্ছে বা হবে তা দেশ এবং জাতিকে পেছনেই টানবে, সামনে এগোতে দেবে না।

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার হাল-হকিকত নিয়ে কিছু বলা বা লেখা জরুরি হয়ে পড়ায় বর্তমান প্রয়াস, ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে প্রায় ১৪কোটি মানুষের মধ্যে কতজন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পান আর কতজন সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন তা মোটামুটি সচেতনজন মাত্রই অনুমান করতে পারেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এ সুযোগ ছিল আরও সীমিত। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কিছু বড় বড় কলেজে কোন কোন বিষয়ে সম্মান কোর্স চালু ছিল। কলেজ থেকে সম্মান বা অনার্স শেষ করে ছাত্রদের স্নাতকোত্তর করার জন্য যেতে হতো বিশ্ববিদ্যালয়ে। '৪৭-এর পর নানাভাবে নানা কারণে অনেক কলেজ থেকে অনার্স-কোর্স উঠে যায়। গত শতকের দুয়ের দশকে আবার কিছু কিছু কলেজে অনার্স কোর্স চালু হয়। দেশ স্বাধীনের পর আরও কিছু কলেজে অনার্স এবং স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হতে থাকে এবং তা হয় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন; এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে। আগের ধারা অব্যাহত রেখে অনেক কলেজে আবার শুধু অনার্স চালু হয়, স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি ভর্তি হতে হয়। কলেজে আবার শুধু অনার্স কোর্স চালু হয়, স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি ভর্তি হতে হয়। কলেজ ছাড়া দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য রয়েছে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ উল্লিখিত তিনটি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলোর আসন বা সিট সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। ফলে প্রতি বছর প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হতে এ চার বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ভিড় পড়ে। এর মধ্যে মেধাবী এবং ভাগ্যবানরাই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার এমনই এক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়'। কোন ক্যাম্পাস, স্কুল ছাড়া শুধু 'অধিভুক্তিদানকারী' প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এর যাত্রা শুরু। প্রথমে ইস্কাটনের ভাড়া বাড়িতে এবং পরে গাজীপুরে। শুরুতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বিভিন্ন পদে নিয়োগ পান তাদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া কারও সঙ্গেই দেশের সাধারণ শিক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা কার্যক্রমের কোনটির সঙ্গেই কোন সম্পর্ক ছিল না। তারা এসব পদে বসে প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা তো দূরের কথা, তাদের প্রতিপক্ষ ভাবতে থাকেন। 'জাতীয়' এ কথাটি যুক্ত থাকায় অনেক কর্মকর্তাই দেশের উচ্চ শিক্ষাকে দেখতে লাগলেন দূরবীনের উলটো দিক দিয়ে বিশ্ব দেখার মতো। 'সব যেন কেমন মজার, খুদে খুদে দেখায়। ফলে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের যে যেখানে বসে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে ভাবেন, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে চান বা করাতে ন (শিক্ষক ও অভিভাবক) সবার রাস্তা ীপুরমুখী। ফলে এ প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের র্তা-কর্মচারীরা নিজেদের জমিদার-শাসকদের ্য ভাববেন— এটা তো স্বাভাবিক। ্যালয়ের কাজে অনভিজ্ঞতা এবং রতার কারণে সৃষ্ট নানা জটিলতার সামগ্রিক ন্ত গিয়ে পড়ে শিক্ষার্থী আর তাদের বকদের ওপর। সেই ভোগান্তির কারণ ভুল। রকম, নানা ধরনের ভুল। প্রশ্নপত্রে ভুল, ত্রে ভুল, সার্টিফিকেটে ভুল, নামে ভুল, নামে ভুল, শিক্ষাবর্ষে ভুল, প্রাপ্ত নম্বরে ভুল— ভুল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিত্যনৈমিত্তিক র। এ ভুল সংশোধনের জন্য সরাসরি আসতে গাজীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। আরেক ন্তি। ভুল সংশোধনের ভোগান্তি।

শের এই একমাত্র অধিভুক্তি (এফিলিয়েশন) নকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট যেন এর গত অধিকার। ফলে কত সালের পরীক্ষা কবে নুষ্ঠিত হবে আর তার ফল কবে বের হবে তা কউ বলতে পারবেন না। এমনও দেখা গেছে রের বছরের পরীক্ষা শুরুর মাত্র কয়েকদিন আগে াগের বছরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। ফলে কৃতকার্যদের জন্য আরও একটি বছর। গত সরকারের আমলে বা গত উপাচার্যের উদ্যোগে এই সেশন জট দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। সৃষ্ট ৩/৪ বছরের সেশন জটকে সমন্বয় করে প্রতি বছরে ২/৩ মাস সমন্বয় করে এক সঙ্গে কয়েক বছরের পরীক্ষার রুটিন দিয়ে দেয়া হয়েছিল; কিন্তু দেশে সরকার পরিবর্তন বা তারও আগে জা.বির উপাচার্য পরিবর্তনের কারণে সেই কর্মসূচি বাতিল বা পরিত্যক্ত হলো। ক্ষমতা পরিবর্তনের দম্ভ দেখাতে গিয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে এতটুকু ভাবলেন না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের চেয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিবর্তনের পালে জোর হাওয়া লাগানোই যেন বেশি জরুরি।

আগেই বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন ক্যাম্পাস নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কাউকে পড়ায় না। সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করানো, ফল প্রকাশ এবং সার্টিফিকেট প্রদান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। গত বছর বা বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে একটি নতুন কার্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে; তাহলো বিভিন্ন কলেজে ছাত্র ভর্তি। এ বছর প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির তদারকি করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কেবল তদারকি নয়, পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। এ নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করতে নিয়ম-কানুনের আদিখ্যেতায় দেশের অনেক বড় বড় কলেজে অনেক বিষয়ে নির্ধারিত আসন পূর্ণ হয়নি, শূন্য পড়ে আছে। আবার কোন কোন কলেজে উপচে পড়া ভিড় সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে অনেক ছাত্র মাদ্রাসা এবং কারিগরি বোর্ড থেকে পাস করা এসএসসি এবং এইচএসসি পর্যায়ের পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়ার সুবাদে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত বিষয়ে। নতুন চার বছরের অনার্স কোর্সের সিলেবাস দেখে এদের অনেকেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

এর ওপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে রয়েছে শিক্ষক সঙ্কট। সরকারি কলেজগুলোতে পদোন্নতি ও বদলি এ সঙ্কটকে আরও গভীর করে তুলেছে। সম্মান এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের অনেক কলেজে শিক্ষক স্বল্পতার সঙ্কট গভীরতর। সাধারণত এ পর্যায়ের কলেজগুলোতে প্রতি বিষয়ে অন্তত ১২ জন শিক্ষক থাকার কথা। আমাদের জানা মতে বর্তমানে দেশের কোন বিষয়ে পূর্ণ সংখ্যক শিক্ষক নেই। ঢাকা শহরে দুয়েকটি কলেজে দুয়েকটি বিষয়ে থাকতে পারে; কিন্তু ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে নির্ধারিত আসন সংখ্যা অনুযায়ী। ফলে কোন কোন কলেজে কোন কোন বিষয়ে চার-পাঁচ বা ছয়-সাত জন শিক্ষক নিয়ে বিভাগ চালাতে হচ্ছে। বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়গুলোতে এ শিক্ষক স্বল্পতার সঙ্কট দুর্বিষহ যা ছাত্র-শিক্ষককে আরও হতাশাগ্রস্ত করে তোলে।

প্রসঙ্গত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানের অনুমোদন কিংবা আসন বরাদ্দের সময় সংশ্লিষ্ট কলেজে শিক্ষক সংখ্যার বিষয়টি আমলেই আনতে চান না। ফলে অধিকাংশ কলেজের চিত্র এরকম যে, যে বিষয়ে ১২টি শিক্ষক পদ সে বিষয়ে যতটি আসন; যে বিষয়ে ৪ বা ৬টি শিক্ষক পদ সে বিষয়েও একই সংখ্যক আসন। ফলে উচ্চ শিক্ষার জন্য অপরিহার্য ছাত্র শিক্ষক অনুপাত রক্ষিত হয় না। সরকারি কলেজগুলোতে এমন পরিস্থিতির কারণ বোধকরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার বা তার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। সে যে কারণেই হোক এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব আর ভোগান্তি বর্তায় আমাদের সন্তানদের ওপরই।

এ বছর থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৪ বছরের অনার্স কোর্স চালু করেছে। আগের সাবসিডিয়ারি তুলে দিয়ে চার বছরের কোর্সে বিষয়কে নির্ধারণ করা হয়েছে 'প্রধান' ও 'অপ্রধান' নামে। ইংরেজি বলা হচ্ছে 'মেজর' এবং 'নন-মেজর'। আগের সাবসিডিয়ারির পরিবর্তে 'নন-মেজর'। সাবসিডিয়ারিতে অনেকগুলো বিষয়ের মধ্য থেকে ছাত্রছাত্রীদের যেকোন দু'টি বেছে নেয়ার সুযোগ ছিল। বর্তমানে নন-মেজর বা অপ্রধান বিষয়কে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। যেমন কলা বিভাগে বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, দর্শনের যেকোন বিষয়ে অনার্স পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য অপ্রধান বিষয় নির্ধারণ করা হয় মাত্র দু'টি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান বা সমাজকল্যাণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সবার জন্য বাধ্যতামূলক। কোন কলেজে এ ৭টি বিষয়ে ২শ' করে আসন থাকলে মোট ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ৪শ'। প্রশ্ন হলো বাকি ১ হাজার ২শ' ছাত্রছাত্রীকে অপ্রধান রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াবে কে? সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১২টি পদে ১২ জন শিক্ষকও যদি নিয়োজিত থাকেন, তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্সের ২শ' ছাত্রের মেজর ৩০০ নম্বর এবং নন-মেজর ১০০ নম্বর পড়ানো কতটুকু সম্ভব? সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ের ক্ষেত্রে এ অবস্থা আরও দুর্বিষহ। আমাদের জানা মতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৫টির বেশি কলেজে সমাজবিজ্ঞান বিভাগই নেই। সমাজকল্যাণ বিভাগ আরও কম কলেজে। বড় জোর ৬/৭টিতে। এর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই কলেজে এ দু'টি বিষয়ই চালু আছে। তাহলে প্রশ্ন, যেসব কলেজে সমাজবিজ্ঞান বা সমাজকল্যাণ নেই সেসব কলেজে অপ্রধান বিষয় দু'টি পড়াবে কে? অনেক কলেজের অধ্যক্ষরা প্রধান বিষয়ের শিক্ষকদেরই অপ্রধান বিষয় পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অনেক কলেজে ইংরেজি, বাংলা, দর্শনের শিক্ষকরা এখন সমাজবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের বই বগলদাবা করে ছুটে বেড়াচ্ছেন জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে। শিক্ষক সংখ্যা কম এমন অনেক কলেজে প্রধান-অপ্রধান একাকার হয়ে গেছে। এসব ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে শিক্ষক-অভিভাবক সবাই চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

সিলেবাসে এমন সমস্যা বাণিজ্য বিভাগেও আছে। জা.বির অধিকাংশ কলেজে অনার্স আছে দু'টি বিষয়ে— হিসাববিজ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনা। এই দুই বিষয়েই অপ্রধান বা নন-মেজর বিষয় হিসেবে পড়াতে হবে ফিনান্স, মার্কেটিং এবং ব্যাংকিং। জানামতে, দেশে খুব কম কলেজেই এসব বিষয় পড়ানো হয়। ফলে মানবিক বিভাগের মতো বাণিজ্য বিভাগের সমস্যাও কম নয়। বিজ্ঞান বিভাগে এ সমস্যা অনেকটা কম। কেবল গণিতের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অন্যতম বাধ্যতামূলক অপ্রধান বিষয় পরিসংখ্যান নিয়ে এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে গণিতের শিক্ষকরা এটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন বলেই ধারণা।

চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সের পুরো সিলেবাস এখনও তৈরি করতে পারেননি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কেবল প্রথম বছরের সিলেবাস বা পাঠক্রম কলেজগুলোতে পাঠানো হয়েছে। প্রথম বর্ষের সিলেবাসে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন প্রথম বছরে ছাত্রছাত্রীদের কত নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেয়া সম্ভব নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই এক বছরের পরীক্ষার নম্বর সর্বনিম্ন ৪০০ এবং সর্বোচ্চ ৫৭৫। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, বাংলা বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে হবে ৪০০ নম্বরে আর রসায়নের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এ নম্বর ৫৭৫। এক বছরের এ সিলেবাসের বৈচিত্র্য এ রকম; বাংলা ৪০০, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে ৪১০ করে, প্রাণিবিদ্যা ৪২৫, উদ্ভিদবিদ্যা এবং গণিত ৪৫০ করে, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় ৪৭৫ করে এবং হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনায় এই নম্বর ৫০০। এখানেই শেষ নয়, আরও বৈচিত্র্য আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান বা মেজর বিষয়ে ২০০ নম্বর বরাদ্দ থাকলেও ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রসায়নে রয়েছে ৩০০ করে নম্বর। আবার ইতিহাস এবং গণিতে এই নম্বর ২৫০।

সিলেবাসে প্রতিটি বিষয়ে কিছু মানোনীত (টেক্সট ও রেফারেন্স) বইয়ের তালিকা দেয়া আছে। বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান বিভাগের তালিকায় বাংলা ভাষায় লেখা কোন বইয়ের নাম নেই। কলা বিভাগের অনেক বিষয়ে বাংলায় লেখা বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। এই সিলেবাস দেখে অনেক ছাত্রছাত্রীকেই হাপিত্যেশ করতে দেখা গেছে।

চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সের কেবল প্রথম বর্ষের সিলেবাস প্রকাশিত হলেও এর সঙ্গে পাঠানো চিঠিতে (চিঠি নং জাতীঃবিঃ/কারি/২০০২/১০১৩ তাং- ২২/৬/০২) লেখা আছে 'উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়টি তিনটি অংশে বিভক্ত। ১ম অংশে ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ২য় অংশে রাজনৈতিক বিবর্তন এবং ৩য় অংশে অর্থনৈতিক অবস্থা ও উন্নয়ন থাকবে। উল্লেখ্য, অংশগুলো যথাক্রমে ইতিহাস অথবা ইসলামের ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি বিষয়ের শিক্ষকরা পড়াবেন।' এমন নির্দেশ বাণীতে কলেজ শিক্ষকরা যে আরও হতাশ আরও বিব্রত হবেন সে তো স্বাভাবিক। যদি সকল বিষয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকে ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির শিক্ষকদের বাংলাদেশ স্টাডিজ পড়াতে হয় তাহলে তাদের মেজর, নন-মেজর পড়াবেন কখন? তাছাড়া শিক্ষক স্বল্পতা এবং শিক্ষকের পদের স্বল্পতার সমস্যা তো আছে সব কলেজেই।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' নামের প্রতিষ্ঠান এবং এর করিতকর্মা কর্মকর্তারা দেশের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে গভীর ও বিচিত্রমুখী গবেষণায় ব্যস্ত। দেশের কলেজগুলো এদের গবেষণাগার এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা যথোপযুক্ত ও যথার্থ গিনিপিগ। এ গবেষণায় হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে দেশের ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবক-সচেতন মানুষ সবাই। সে সঙ্গে এই হতাশা থেকে পরিত্রাণও চায় সকলে; কিন্তু দায় কার? আমাদের ধারণা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যাল উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শি সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি এবং দেশের প্রতিথয শিক্ষা-চিন্তাবিদদের সমন্বিত প্রচেষ্টাই দেশের উ শিক্ষার এ ব্যাপক পরিসরকে সঠিক পথনির্দেশনা দিতে পারে। অন্যথায় উচ্চ শিক্ষার নামে যা হচ্ছে বা হবে তা দেশ এবং জাতিকে পেছনেই টান সামনে এগোতে দেবে না।

এ বিষয়ে আমাদের কিছু প্রস্তাব আছে। সেগুলো হতে পারে (১) সব বিষয়ে সিলেবাস, পাঠ এবং নম্বর বণ্টনে সমন্বয় সাধন, (২) অপ্রধান নন-মেজর বিষয় নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ প্রদান, (৩) বাংলা ভাষায় টেক্সট ও রেফারেন্স বইয়ের তালিকা প্রণয়ন ও প্রেরণ, (৪) কলেজগুলোর শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, (৫) অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষাদানকারী কলেজগুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক পদ সৃষ্টি করে শিক্ষক নিয়োগ